কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

বইতরণী

উন্নয়নের জেরে বিপন্ন প্রাণী

বিশ্বায়ন ও হাতি' বইটির লেখক কিশোর চৌধুরীর নেশা ছিল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো। পাহাড়ে ট্রেকিং। গাড়ি নিয়ে দুর্গম অঞ্চলে ঘোরা। এমন হয়তো অনেকের মধ্যে দেখা যায়। তবে যে নেশা নিয়ে লেখক কিশোর চৌধুরী ছুটেছেন তার মধ্যে ছিল জঙ্গলের মানুষ এবং প্রাণীদের প্রতি এক বিশেষ আন্তরিক আবেগ। অন্য কোথাও অন্য কিছু যা আছে তার জন্য ছিল নিরন্তর সন্ধান। ফলে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যকে দু'হাতে সরিয়ে তিনি ঝাড়খণ্ডের বেতলা থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে মারোমার নামে এক আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বাড়ি বানিয়ে বাস করতেন। তাঁর স্ত্রী পাপড়ি চৌধুরী ছিলেন সর্বক্ষণের সঙ্গী। বেতলার জঙ্গল আর হাতিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার জন্য তাঁদের এই প্রয়াস।

লেখকের কাছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাব আসে খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চল সম্পর্কে ভৌগোলিক বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য। এই বিশ্লেষণের অন্যতম বিষয় ছিল হাতির বাসস্থান ও চলাফেরা। কিশোর চৌধুরী লেখালেখি করতেন ইংরেজিতেই। 'বিশ্বায়ন ও হাতি' অবশ্য তিনি লিখেছিলেন বাংলায়। 'একুশ শতক' পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিকটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকের কাছে এল এক অন্য জগতের সন্ধান। যাতে পাওয়া যাবে গবেষণার পাশাপাশি দেখা আদিবাসী মানুষ প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীর প্রতি অমলিন ভালোবাসা ও বেদনাবোধের ছবি।

কিশোর চৌধুরীর জাদু কলমের ছোঁয়ায় অনেক বিষয় বলেছেন সরস ও তির্যক ভঙ্গিতে। এঁকেছেন গোয়াবাগানের এক ভাড়াবাড়ির ছবি। জানিয়েছেন নানা জাতের পাখি নিয়ে থাকা ঠোঙা বানানো পাখি মায়ের কথা। দেশ ভাগ হওয়ার আগে যিনি ছিলেন তিন পুরুষের প্রজাদের কর্তা মা।

কাহিনির প্রধান চরিত্র পটকা হো যার আসল নাম সূর্যাশিস। তারই মাধ্যমে লেখক শুনিয়েছেন অনেক অজানা বিষয়। লুপ্ত ইতিহাস। কাহিনিতে এসেছে সম্পতিয়া ও তার মরদ। হাতির প্রতি পটকা হো–র ভালোবাসা সম্পতিয়া দেখেছে খুব কাছ থেকে। সেও বুঝতে পারে হাতিদের দুঃখ কষ্ট। ভয়ঙ্কর গরমে হাতিদের জল খাওয়ানোর যে চেষ্টা পটকা হো–র তা মনকে দ্রব করে তোলে। একদিকে যখন পটকা হো হাতিদের জলের জোগান দিয়ে আনন্দিত তখন বাঁচার তাগিদে জঙ্গল থেকে আসা তৃষ্ণার্ত দাঁতাল হাতি আটার গোলা আর ইউরিয়া মেশানো জল পান করে মারা যাওয়ায় শোকে আকুল।

বইটিতে যেভাবে বন্যপ্রাণী ও আদিবাসী মানুষের উৎখাতের বর্ণনা করা হয়েছে যাতে প্রকৃত সত্য জানার পরে মনে হবে যেন প্রতিটি শব্দ লেখকের হৃদয় নিংড়ে স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছে। এই আবেগ পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হবে।

ব্রিটিশরাজের তৈরি বনসংরক্ষণ নীতি ছিল জঙ্গলববাসীদের বিপক্ষে এক অস্ত্র। স্বাধীন ভারতেও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃত অর্থে বদল না হওয়ায় আদিবাসীরা উন্নয়নের নামে হয়ে যায় গৃহহীন। শুরু হয় বিদ্রোহের নানা রূপ। যা বিদ্রোহীদের জীবনযাপনকেও যেমন বিপর্যস্ত করে তোলে তেমনই রাষ্ট্রযন্ত্রও পরিচিত হয় শোষক হিসেবে। এই সমস্যার কোনও সমাধান নেই? আছে। তবে তা বাস্তবায়িত করার ও পরিকাঠামোকে সুবিন্যস্ত করার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসবে কে?

জুলুমের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় অসন্তোষ। ফলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শুধু বস্তারের আদিবাসীরাই নয় দেশের যেখানে যত অত্যাচারিত মানুষ আছে সবার মধ্যেই জন্ম নেয় বিদ্রোহ। উন্নয়নের নামে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের আইনের মাধ্যমে উৎখাত করার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই। বরং বিভিন্ন জাতিকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের সংস্কৃতিকে যদি উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় তবে দেশের মুকুটে অনেক রঙিন পালক শোভা পেতে পারে।

উন্নয়নের নামে দেশের হাজার হাজার একর অঞ্চলের জঙ্গল কেটে পরিস্কার করে খনিজ সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে। উধাও হচ্ছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক। উধাও হয়ে যাচ্ছে নানা ধরনের বন্যপ্রাণী।

বিশাল রাষ্ট্রযন্ত্র। সেখানকার কতিপয় মানুষের তাৎক্ষণিক ভাবনার চিন্তার ফসল যে সবসময় ভালো হবে তার কোনও অর্থ নেই। বিপরীত মত থাকতেই পারে, সেটা যে বিদ্রোহ নয় এ কথাও বুঝতে হবে। চাকরি করতে এসে অবসর নেওয়া অবধি যে দায়িত্ব নিয়ে একজন কাজ করেন তার যদি অক্ষম প্রয়োগ হয় তা সবসময় জনমোহিনী নাও হতে পারে। এ কথা বুঝতে গেলে একটা বড় হৃদয়ের প্রয়োজন যা কখনও শরীরকে ছাড়িয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। তাতে দেশ সমৃদ্ধ হবে। পটকা হো মনে করে, ফরেস্টের অফিসাররা বন্যজন্তুদের জন্য কিছু করছে না। অফিসের বাইরে তাঁরা বেরোন না ভয়ে। জঙ্গলে আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই তাঁরা নিতে সাহস পান না। ফলে জঙ্গল উধাও হচ্ছে। লুপ্ত হচ্ছে প্রাণীরা। হাতি খেদা ও তাদের বেচাকেনার মধ্য দিয়ে হাতির সংখ্যা কমছে। জঙ্গল না থাকায় হাতি চলে আসছে লোকালয়ে। সেখানে আদর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হচ্ছে অনেক হাতির আরও নানা সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসা দরকার।

'বিশ্বায়ন ও হাতি' বইটিতে স্বল্প পরিসরে অনেক অজানা কথা বলেছেন লেখক। আদিবাসীমানুষ ও বন্য জন্তুদের টিকে থাকার লড়াইয়ে মানসিকভাবে সামিল হতে চেয়েছেন।

তবে বইটির সঙ্গে ছবি দেখলে মনে হয় লেখক তথ্য সংগ্রহ করে শুধু তা দিয়ে কাহিনি বিস্তার করেননি। বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। পটকা হো নামের আড়ালে লেখককে খুব বেশি মনে পড়বে পাঠকের।

বিশাল রাষ্ট্রযন্ত্র। সেখানকার কতিপয় মানুষের তাৎক্ষণিক ভাবনার চিন্তার ফসল যে সবসময় ভালো হবে তার কোনও অর্থ নেই। বিপরীত মত থাকতেই পারে, সেটা যে বিদ্রোহ নয় এ কথাও বুঝতে হবে। চাকরি করতে এসে অবসর নেওয়া অবধি যে দায়িত্ব নিয়ে একজন কাজ করেন তার যদি অক্ষম প্রয়োগ হয় তা সবসময় জনমোহিনী নাও হতে পারে। এ কথা বুঝতে গেলে একটা বড় হৃদয়ের প্রয়োজন যা কখনও শরীরকে ছাড়িয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। তাতে দেশ সমৃদ্ধ হবে।

বইটিতে যেভাবে বন্যপ্রাণী ও আদিবাসী মানুষের উৎখাতের বর্ণনা করা হয়েছে যাতে প্রকৃত সত্য জানার পরে মনে হবে যেন প্রতিটি শব্দ লেখকের হৃদয় নিংড়ে স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছে। এই আবেগ পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হবে

বিশ্বায়ন ও হাতি ঃ কিশোর চৌধুরী। একুশ শতক। ১০০ টাকা